উত্তরসূরি

আরিফুল ইসলাম

ওয়াফি পাবলিকেশন

এক.

মৎস্য ভবনের সামনে লম্বা জ্যাম। বিকেলবেলা মৎস্য ভবনের জ্যামে পড়লে আধা ঘণ্টা মাটি! বাসে থাকলে হেলান দিয়ে বই নিয়ে বসতে পারতাম। পছন্দের বই সাথে থাকলে জ্যাম না মহা-জ্যাম থাকুক, চিন্তা ছিল না।

ঢাকায় আসার তিন বছর হয়েছে। তিন বছরে যত বই পড়েছি, বেশিরভাগই ছিল জ্যামে বসে। আশেপাশের মানুষ দেখতাম হাঁসফাঁস করত, আমি শান্তিমনে বই পড়তাম। কেউ কেউ দেখতাম আমার দিকে এমনভাবে তাকাত, মনে হতো আমার আনন্দ দেখে তাদের অস্বস্তি হচ্ছে। গরমের মধ্যে আমাকে বই পড়তে দেখে তাদের গরম মনে হয় বেড়ে যায়। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে আবার বই পড়া শুরু করতাম।

আজ আর বই পড়া হবে না। রিকশায় বসে আছি, বই বের করতে নিজের কাছেই অস্বস্তি লাগছে। ক্লাসে সারাক্ষণ যারা বই নিয়ে পড়ে থাকে, তাদেরকে বন্ধুরা একটি ডাকনাম দেয়। আড়ালে সেই নামে তাকে ডাকে। রিকশায় বসে বই বের করে পড়া শুরু করলে আশেপাশের অপরিচিত লোকজনও হয়তো আমাকে সেই নামে ডাকবে। দুষ্টুমির ছলে কেউ ডাক দিয়ে জিজ্ঞেসও করতে পারে—'পণ্ডিতমশাই, কই যান?'

গাড়ি জ্যামে পড়লে মানুষজন অস্বস্তি কাটাতে কী করে সেটা দেখতে লাগলাম। ঢাকা শহরের মানুষের জীবনযাত্রা বুঝতে জ্যামের দৃশ্য যথেষ্ট। ধনী-গরিব, কোটিপতি-ফকির, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, দুর্নীতিবাজ-সৎ সবাই এই জ্যামে আটকে আছে। পাঁচ মিনিটের সিগন্যাল একেকজন একেকভাবে কাজে লাগাবে।

রাস্তার পাশের ভিখারি বাটি হাতে বেরিয়ে পড়ছে। তাদের টার্গেট প্রাইভেট কার। সবগুলো কারের গ্লাস বন্ধ। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করলে যদি খুলে এই আশায় তারা গ্লাসে টোকা দিচ্ছে। মাঝবয়সি এক লোক, মাথায় উশকোখুশকো চুল। ভিক্ষার বাটি হাতে নিয়ে অনবরত একটি গ্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। গাড়ি জ্যামে পড়লে সবাই কারের গ্লাস খুলে না। বাদাম-পানি কেনার জন্যই গ্লাস খুলে না, ভিক্ষুকের জন্য খোলা তো দূরের কথা।

না খোলার কারণ আছে। একদিন এমন একটি কারণের প্রত্যক্ষদর্শী হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছিল।

সেদিন বাসে বসা ছিলাম। আমার ঠিক পাশে একটি কারে করে সুটেড-বুটেড একজন লোক বসা। আইনজীবী বা কোনো কোম্পানির অফিসার হবেন। দশ-বারো বছর বয়সি এক ছেলে করুণ কণ্ঠে বলে যাচ্ছিল, 'স্যার, দশটা টেকা দ্যান, দুপুরে কিছু খাই নাই। স্যার, দেন...।'

আমি দেখতে লাগলাম কারে বসা লোকটি কী করে। এমন করুণ কণ্ঠের আবদার কি তিনি ফিরিয়ে দেবেন, নাকি মানিব্যাগ থেকে দশ টাকা বের করে দেবেন। অনেকক্ষণ পর তিনি মানিব্যাগ বের করলেন। দশ টাকা না, একশ টাকার একটি নোট বের করে দিলেন। ডানহাতে একশ টাকার নোট, বামহাতে মানিব্যাগ।

যে ছেলেটি এতক্ষণ ধরে দশ টাকার জন্য আবদার করে যাচ্ছিল, দাতা যখন একশ টাকা দিলেন, সে একশ টাকা না নিয়ে দাতার মানিব্যাগ টান দিয়ে দৌড় দিলো! দুই পাশের গাড়িগুলো এত গিজিবিজি ছিল, গাড়ির দরজা খোলার জায়গা নেই। সুটেড-বুটেড লোকটি কারের গ্লাস থেকে মাথা বের করে দেখলেন ছেলেটা আর দৌড়াচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে ফুটপাত দিয়ে যাচ্ছে। একবারের জন্য পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। সে জানে তাকে কেউ তাড়া করবে না। দৌড়ালে বরং আশেপাশের লোকজন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে।

ঠিক তখন সিগন্যাল ছেড়ে দিলো। পেছনের গাড়িগুলো স্টার্ট দিলো। গাড়ি একপাশে ব্রেক করে দরজা খোলা গেলেও ভিক্ষুকবেশী চোরকে ধরা যাবে না।

সুটেড-বুটেড লোকটির দুশ্চিন্তার কথা চিন্তা করলাম। একজন কারের মালিক

চাকরিজীবীর মানিব্যাগে কত টাকা থাকতে পারে? ১০,০০০ টাকা? টাকার জন্য তার যতটা না দুশ্চিন্তা হবে, তারচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হবে হয়তো মানিব্যাগে থাকা এটিএম কার্ড, আইডি কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের জন্য।

উশকোখুশকো চুলের লোকটি কারের ভেতরে বসা মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হলো। এবার সে রিকশার যাত্রীদের দিকে বাটি এগিয়ে দিচ্ছে। একজন পাঁচ টাকা বের করে দিলো। লোকটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সে হয়তো বুঝতে পেরেছে এই জ্যামে কারওয়ালাদের কাছে কিছু পাওয়া যাবে না।

ভিক্ষুকদের দেখলে আমরা চিন্তা করি পকেটে খুচরো আছে কি-না। মনে মনে মানিব্যাগের কোনায় দুই টাকা, পাঁচ টাকার কয়েন খুঁজতে থাকি। আমি মানিব্যাগ বের করলাম না। শার্টের পকেটে দুই টাকার কয়েন ছিল। কয়েনটি বাটিতে রাখার সাথে ঝনঝন করে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যে জ্যাম ছেড়ে দেবে। এই জ্যামে ভিখারির 'আয়' হলো মাত্র সাত টাকা। সব বলে তো আর উইকেট পাওয়া যায় না। ওয়ানডে ক্রিকেটে একজন বোলার ষাট বল করলে তিন-চারটা উইকেট পান। বোলার হয়তো পঁচিশ-ত্রিশটি বল করেছিলেন উইকেট পাবার জন্য।

দিনে মৎস্য ভবনে সিগন্যাল পড়ে কয়বার? দশ মিনিট পরপর একবার সিগন্যাল পড়লে ঘণ্টায় ছয়বার। মধ্যবয়সি ভিখারি দিনে দশ ঘণ্টা জ্যামে ভিক্ষা করে প্রতিবার গড়ে পনেরো টাকা পেলে একদিনে কত টাকা ভিক্ষা করে?

সহজ গুণটি করতে পারলাম না! ক্যালকুলেটরের ওপর অতি নির্ভরশীলতা আমাদের ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট করে দিচ্ছে। সামান্য জটিল যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের হিসেব করতে গেলে আমরা ক্যালকুলেটর খুঁজি।

সিগন্যাল ছাড়ল। সবগুলো গাড়ি বন্ধ ছিল। সবাই একসাথে স্টার্ট দিলো। এখন শুরু হবে গাড়ির হর্ন। কে কার আগে সিগন্যাল ক্রস করবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সব গাড়ি একসাথে সিগন্যাল পার হতে পারবে না। আমাদের রিকশাওয়ালা মামা ধীরেসুস্থে রিকশা টানছেন। মৎস্য ভবনের সিগন্যাল পার হতে আরেকটি সিগন্যালে বসে থাকতে হবে।

গ্রীষ্মকালীন অবকাশ আগামীকাল থেকে শুরু। ভার্সিটি পনেরো দিন বন্ধ। এবার ছুটি কাটাতে গ্রামের বাড়ি যাব না। ছোটো-বড়ো সব ছুটি সাধারণত গ্রামে কাটাই। বিশেষ কারণে এবারের ছুটি কাটাব মামার বাসায়। মামার বাসা মালিবাগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডক্টর শামসুদ্দীন আহমেদ আমার মামা। মামার সাথে আমার সম্পর্ক আমি এতটা উপভোগ করি, নিশ্চিন্তে পুরো সামার ভেকেশন মামার সাথে কাটাতে পারব। আমার বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছেন 'শামসু' মামা। শামসুদ্দীন মামাকে সংক্ষেপে সবাই শামসু ডাকে।

ঈদের ছুটিতে নানাবাড়ি গেলে মামার সাথে দেখা হতো। পরিবার নিয়ে ঈদের ছুটি তিনি গ্রামে কাটাতেন। প্রতিবার আমার জন্য বই নিয়ে যেতেন। গ্রামের বাজারে 'লাইব্রেরি' নামে যেসব দোকান দেখতাম, সেগুলো মূলত স্টেশনারি দোকান। খাতা, কলম, গাইড বুক, রাবার, পেন্সিল, ক্যালকুলেটর—এগুলোই পাওয়া যায়। পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বইকে বলতে হতো 'আউটবই'। আউটবই নামে যে দু-চারটা বই পাওয়া যেত, সেগুলো আমাদের বাড়িতেই দেখতাম। মোকসেদুল মুমিনীন, বেহেশতী জেওর, বিষাদসিন্ধু।

মামা আমাকে এ পর্যন্ত যতগুলো বই দিয়েছেন, সবগুলো বই একসাথে রেখেছি। গতবার আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে বই গুছিয়ে রাখার সময় মামার দেওয়া বইগুলো আলাদা একটি ক্যাটাগরিতে রেখেছিলাম। মোট বাষট্টিটি বই। গল্প-উপন্যাস, জীবনী-আত্মজীবনী, ইতিহাস, কবিতা নানান ক্যাটাগরির বই দিয়েছিলেন। মামা আমার আগ্রহ খুঁজে বের করেন। একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোন বইটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে?'

আমি বলেছিলাম, মাইকেল এইচ. হার্টের 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষী' বইটির কথা। জে.এস.সি পরীক্ষায় পাস করার পর বইটি পেয়েছিলাম। বইটি পাবার পর যখন দেখলাম একজন খ্রিষ্টান লেখক প্রথমে রেখেছেন আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তখন এত খুশি হয়েছিলাম যে, সেইদিন একসাথে দশ জন মনীষীর জীবনী পড়ে ফেলি।

প্রতি সপ্তাহে একজন-দুজন করে মনীষীর জীবনী পড়তাম। একেকজনকে নিয়ে চার-পাঁচ পৃষ্ঠার তথ্য পড়ে তৃপ্তি পেতাম না। তখন মাথায় একটি বুদ্ধি আসে।

বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটির পর অনেক বন্ধু সাইবার ক্যাফে যেত। এক ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্রাউজিং বিশ টাকা। অনেকেই সাইবার ক্যাফে গিয়ে গেইম খেলত, ভিডিও দেখত। আমি করতাম আমার সবচেয়ে পছন্দের কাজ। যে সপ্তাহে যার জীবনী পড়তাম, তার নাম লিখে গুগলে সার্চ দিতাম। অনেক তথ্য আসত। বাংলা এবং ইংরেজিতে। ইংরেজি প্রবন্ধ পড়তে পারতাম। ভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারে এসে দেখি আমার অনেক বন্ধু ইংরেজিতে কোনো প্রবন্ধ পেলে এড়িয়ে যায়। ক্লাস নাইনে থাকতে আমি মনীষীদের জীবনী পড়তাম ইংরেজিতে।

সাইবার ক্যাফে থেকে বের হবার পর ডায়েরিতে তিন-চার পৃষ্ঠা থাকত সেই মনীষীকে নিয়ে। এস.এস.সি পরীক্ষার আগেই বিশ্বের একশজন মনীষীর জীবনের সাথে পরিচিত হই, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যে ডায়রিতে লিখি, সেটাও পূর্ণ হয়।

শামসু মামার সাথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতেন, 'আনাস, জোহান্স গুটেনবার্গের জীবনী কেমন লাগল?'

'আমার মনে হয় তো মামা তিনি ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারক। আজকের যুগে প্রিন্টিং প্রেস ছাড়া আমরা চিন্তাই করতে পারি না। তার আবিষ্কারের পরই তো ইউরোপে জ্ঞানের রেনেসাঁ শুরু হয়।'

তাস খেলতে গিয়ে জোহান্স গুটেনবার্গ কীভাবে কাঠের ব্লক বানান, পাদরির প্রস্তাবে কীভাবে প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কার করেন—এই গল্প মামা বিস্তারিত বলেন। মামা গল্প বলা শুরু করলে তন্ময় হয়ে শুনি। আগামী পনেরো দিন মামার সাথে কাটাতে পারব। ভাবতেই শিহরণবোধ করছি।

রিকশা মালিবাগে মামার বাসার সামনে থামল। পকেট থেকে একশ টাকার নোট বের করে দিলাম। মুহসিন হল থেকে মালিবাগ একশ টাকা ভাড়া। ঢাকা রিকশার শহর হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা শহরে রিকশা ভাড়া গ্রামের দ্বিগুণ।

লিফটের তিনতলায় মামার বাসা। কলিংবেল চাপলাম। দরজা কে খুলবে অপেক্ষায় থাকলাম। মামা নাকি মুয়ায?

দুই.

প্রফেসর ডক্টর শামসুদ্দীন আহমেদ আসরের নামাজ পড়ে বাসায় ফিরলেন। বাসা থেকে মসজিদে যেতে মাত্র ৩ মিনিট লাগে। মালিবাগের আবু যর গিফারী কলেজের পাশে তার বাসা। তিন তলার ফ্ল্যাটটি তার নিজের। পনেরো বছর ধরে মালিবাগে বসবাস করেন।

বৃহস্পতিবার শামসুদ্দীন আহমেদ ক্লাস নেন না। সেমিস্টারের শুরুতে রুটিন করার সময় আগে থেকেই বলে রাখেন। ভার্সিটির শিক্ষকদের অবশ্য নিজেদের রুটিন পরিবর্তন করার অধিকার থাকে। রুটিনে বৃহস্পতিবার ক্লাস দেওয়া থাকলে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে সেটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রফেসর হবার পর থেকে এটা আর বলে দিতে হয় না। সবাই জানে, শামসুদ্দীন স্যার বৃহস্পতিবার ডিপার্টমেন্টে থাকেন না।

শুক্র-শনিবার ভার্সিটি বন্ধ থাকে। ছুটির তালিকায় বৃহস্পতিবার যোগ হলে একটানা তিনদিন ছুটি। এই তিনদিনে অনেককিছু করা যায়। শামসুদ্দীন আহমেদের মতে, ‘একজন শিক্ষক আজীবন ছাত্র’। অন্যান্য পেশাজীবীদের তেমন পড়ালেখা না করলেও চলে। শিক্ষককে সব সময় পড়ালেখা করতে হয়, ক্লাসের আগে পড়া দেখে যেতে হয়, নতুন নতুন বই পড়তে হয়। একজন শিক্ষককে সব সময় নিজেকে আপডেট রাখতে হয়। কোনো শিক্ষক যদি এটা করতে ব্যর্থ হন, শিক্ষার্থীরা কিছুদিন পর তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা ক্লাস করতে আগ্রহ পায় না। ভার্সিটিতে ৭৫% এটেন্ডেন্স নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়ে তারা ক্লাসে থাকে।

শামিমা বেগম বাজার ব্যাগ নিয়ে এলেন। তার হাতে বাজারের লিস্ট। শামসুদ্দীন আহমেদ মাসে দুইবার বড়ো বাজার করেন। টুকটাক বাজার যেকোনো সময় করা যায়। আজ বড়ো বাজার করবেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মুয়ায কোথায়?’

‘আনাসের সাথে গল্প করছে।’

‘আনাস কখন আসছে?’

‘তুমি নামাজে যাবার পর আসছে।’

‘ওহ! কিছু খেতে দিয়েছ?’

‘বেলের শরবত বানিয়ে দিয়েছি। নাস্তা দিইনি, ভাবলাম টেবিলে ভাত বেড়ে দেবো। মুয়াযও খায়নি। একসাথে বসে পড়বে।’

‘ভালো করছ। হলে থাকে, কী খায় না খায়! হলের ক্যান্টিনে তো দুপুরের খাবার বারোটায় শুরু হয়। ভালো খাবার দুটোর মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ওর জন্য আলাদা কিছু নিয়ে আসব? ও কী খায় জানো?’

শামিমা বেগম আনাসের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ভালোই জানেন। খাবারের বেলায় আনাস এত চুজি, ভর্তির সময় এক সপ্তাহ বাসায় থেকেছিল, তখন লক্ষ করেছেন সবকিছু সে খায় না। আনাস আজকে আসবে সেটা বাসার সবাই জানত। বাজারের লিস্টের সময় আনাসের জন্য আলাদাভাবে ইলিশ মাছ, ফার্মের সাদা মুরগি, সবজি লিখেছেন। ফার্মের মুরগি এই বাসায় কেউ খায় না। সবাই দেশি মুরগি খায়। আনাসের ক্ষেত্রে উল্টো। সে দেশি মুরগি খায় না, ফার্মের মুরগি খায়!

শামসুদ্দীন আহমেদ লিস্ট হাতে উঠে দাঁড়ালেন। ড্রাইভারকে ছুটিতে পাঠিয়েছেন। সপ্তাহে দুদিন ছুটি। বুধবার রাতে ছুটিতে যাবে, শুক্রবার রাতে চলে আসবে। এই দুদিন তিনি নিজে গাড়ি চালান। মালিবাগ কাঁচাবাজার বেশি দূর না। হেঁটে যাবেন, রিকশায় চলে আসবেন।

‘আনাসের সাথে দেখা করে যাবে না?’ পেছন থেকে শামিমা বেগম জিজ্ঞেস করলেন।

ঘড়িতে সময় দেখে শামসুদ্দীন সাহেব বললেন, ‘বাজার করে আসি, তারপর কথা বলব। এখন তাকে খেতে দাও। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। মাগরিবের আগে ফিরতে পারব কি-না বুঝতে পারছি না।’

‘আনাস ভাইয়া, কতদিন পর তুমি আমাদের বাসায় এলে! এক বছর হয়ে গেছে না?’

আনাস আঙুলে গুনে বলল, ‘না, একবছর হবে না। সাত-আট মাস হবে হয়তো। শেষবার কুরবানির ঈদের পর বাড়ি থেকে মাংস নিয়ে এসেছিলাম। আর আসা হয়নি। তোমাকে তো কত বলেছি আমাদের ক্যাম্পাসে এসে ঘুরে যাও, তুমি তো যাওনি।’

মুয়ায বলল, ‘সময় পাই না। সময় কীভাবে চলে যায় বুঝতেই পারি না। এই দেখো,

এখনো দুপুরের খাবার খাইনি। তোমাকে নিয়ে একসাথে খাব।'

আনাস হেসে বলল, 'দুপুরের খাবার খেতে ভুলে গেছ নাকি আমার সাথে খাবে বলে খাওনি, হুঁ?'

মুয়ায হাসল। এই হাসি বলে দিচ্ছে আনাসের আন্দাজ ঠিক আছে। যে কয়টা দিন আনাস মামার বাসায় থাকবে, মুয়ায চুম্বকের মতো ফুফাতো ভাইয়ের সাথে লেগে থাকবে। আনাস মুয়াযের সাথে যেকোনো গল্প বলার শুরুতে বলে 'তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং' গল্প বলি। মুয়ায সব সময় অপেক্ষায় থাকে, কখন আনাস ভাইয়া তার ইন্টারেস্টিং গল্প বলা শুরু করে। আনাসের মুখে একই গল্প সে অনেকবার শুনেছে। যতবার শুনে, প্রতিবারই প্রথমবারের মতো আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকে। এটা কি গল্পকথক হিসেবে আনাসের স্বার্থকতা নাকি শ্রোতা হিসেবে মুয়াযের স্বার্থকতা?

আনাসের মতো খেলা-পাগল মানুষ মুয়ায খুব কম দেখেছে। স্কুলজীবনে খেলা দেখা নিয়ে একটি গল্প বলেছিল। আনাসের মুখে কমপক্ষে দশবার গল্পটি শুনেছে। সুযোগ পেলে এগারোবারের মতো গল্পটি বলতে বলবে।

আনাস তখন ক্লাস টেনে পড়ে। সামনে এস.এস.সি পরীক্ষা। তখন বিপিএল খেলা চলে। যেসব ছাত্রের কাছে সবাই এ+ আশা করছে, তারা প্রত্যেকেই খেলা-পাগল। হাতে বই নিয়ে তারা খেলা দেখতে বসে। খেলা দেখে, বইও পড়ে। এমন করে কি পরীক্ষায় এ+ পাওয়া সম্ভব?

স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের নিয়ে মিটিং ডাকলেন। পরীক্ষার্থীদের এই অবস্থা শুনে তার চক্ষু চড়কগাছ। এ যেন তীরে এসে তরি ডুবানোর মতো অবস্থা! তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে অনেক বুঝিয়েছেন, কাজ হয়নি। যেই লাউ, সেই কদু।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো দশজন এ+ প্রত্যাশী শিক্ষার্থীদেরকে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে না। তাদেরকে স্কুলঘরের একটি রুমে ব্রেঞ্চ বিছিয়ে থাকতে দেওয়া হবে। পড়াশোনার তদারকি করবেন অঙ্কের শিক্ষক বজলুর রহমান। স্কুলের পাশেই তার বাড়ি। দিনে-রাতে যেকোনো সময় তাদেরকে চোখে-চোখে রাখতে পারবেন।

প্রথম কয়েকদিন জেলখানার মতো দশ জন পরীক্ষার্থীকে স্কুলঘরে রাখা হলো। বাড়ি থেকে তাদের জন্য টিফিন যেত। নতুন জীবন তারাও উপভোগ করল। কিন্তু খেলা

ছেড়ে আর কয়দিন থাকতে পারে? তার ওপর 'সিলেট রয়্যালস' বিপিএলের প্লে-অফে। নিজেদের জেলার খেলা না দেখে তারা থাকতে পারছিল না।

সবাই একটি বুদ্ধি আঁটে। তারা ঠিক করে বিকেলের পর থেকে সবাই একসাথে শব্দ করে পড়বে। সেই পড়াটা টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করবে। সন্ধ্যা হলেই খেলা শুরু। দরজা এমনভাবে বন্ধ করবে, যেন মনে হয় ভেতর থেকে সিটকিনি দেওয়া। ভেতরে বাজবে টেপ রেকর্ডার। বজলু স্যার বাইরে থেকে শুনে যাবেন সবাই পড়ছে। ইনিংস শেষ হলে একজন এসে ক্যাসেট চেঞ্জ করে দেবে। ক্যাসেটের এক অংশ শেষ হলে তো থেমে যাবে। আরেক অংশ বদলে দিতে হবে।

পরিকল্পনামাফিক কাজ ঠিকমতো করে। স্কুলের পাশে রিপনের বাড়িতে লুকিয়ে সবাই খেলা দেখবে। ঢাকার ইনিংস শেষ হলে সায়েম আর আনাস স্কুলঘরে ক্যাসেট চেঞ্জ করে যায়। সবকিছু ঠিকঠাক আগাচ্ছে।

বজলুর রহমান সন্ধ্যায় একবার দেখতে আসেন। সবাই জোরে জোরে পড়ছে দেখে ভেতরে যাননি। দূর থেকে চলে যান।

রাত নয়টা। তিনি আবার স্কুলে আসেন। এবার রুমে গিয়ে কে কী পড়ছে দেখতে গেলেন। দূর থেকে সবার পড়া শোনা যাচ্ছে।

রুমে ঢুকতেই কারেন্ট চলে গেল! সবার পড়া বন্ধ। বজলুর রহমান ভাবলেন কারেন্ট চলে গেছে এ জন্য হয়তো তারা অন্ধকারে কিছু দেখছে না, পড়তে পারছে না। হাতের টর্চলাইট রুমের দিকে তাক করলেন।

জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন। দশ সেকেন্ড আগে যেখানে সবাই জোরে জোরে পড়ছিল, কারেন্ট চলে যাবার পর সেখানে একজনও নেই! দরজার আড়ালে কেউ লুকোয়নি।

কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে বজলুর রহমান দিলেন দৌড়। কিছুদূর দৌড়ানোর পর ইটে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। উঠে আবার দেন দৌড়! পরদিন তার একশ দুই ডিগ্রি জ্বর উঠল। মার খাবার ভয়ে দশ জন শিক্ষার্থীর কেউই স্বীকার করল না টেপ রেকর্ডারের কথা। বজলুর রহমানের গল্পটি পুরো এলাকায় রহস্য সৃষ্টি করে। গ্রামে এসব ঘটনা

মুখে মুখে প্রচারিত হয়। বজলুর রহমানের আহত হবার ঘটনা সপ্তাহজুড়ে এলাকার ‘ব্রেকিং নিউজ’ ছিল।

রাহাতপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিদ্ধান্ত বদলান। দশ জন শিক্ষার্থীকে তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়। ‘যদি কিছু হয়ে যায়’ এই ঝুঁকি নিতে তিনি রাজি না।

খাবার টেবিলে বসে মুয়ায জিজ্ঞেস করল, ‘আনাস ভাইয়া, আজ কোনো ইন্টারেস্টিং ঘটনা বলবে না?’

খেতে বসে গল্প বলা শুরু হলে আনাস ঠিকমতো খেতে পারে না। সবার খাওয়া শেষ, দেখা গেল সে এখনো দুই লুকমা মুখে দেয়নি। টেবিলে তার পছন্দের খাবার। ডিম ভাজি, গরুর মাংস দিয়ে মুগডাল, টমেটো দিয়ে রুই মাছ; সিলেটে এটাকে ‘ঠ্যাঙ্গা’ বলে। অন্যান্য এলাকায় ঠ্যাঙ্গা মানে মানুষকে মারা। সিলেটে প্রতিবেলা খাবারে ঠ্যাঙ্গা থাকেই। টমেটো, জলপাই, আমড়া—যেকোনো টকের সাথে মাছ দিয়ে এটা রান্না হয়।

হলের ক্যান্টিনে মাত্র এক পদ দিয়ে খেতে হয়। সাথে পাতলা ডাল। অনেকদিন পর চোখের সামনে সুস্বাদু খাবার দেখে আনাসের গল্প করতে ইচ্ছে করছে না। খাবার পর অনেক সময় পাওয়া যাবে। তখন না হয় আজকের রিকশাওয়ালা মামার গল্প বলবে। যাকে প্রথম দেখায় আনাস ভেবেছিল, শিবনারায়ণ চন্দরপল বুঝি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে রিকশা চালানো শুরু করেছে!

তিন.

শামিমা বেগম ল্যাপটপ নিয়ে বসলেন। ডানপাশে কফির মগ। ল্যাপটপের উইন্ডোজ ওপেন হতে হতে কয়েক চুমুক কফি খেলেন। কাজে বসলে কফি খেতে ভুলে যাবেন। ঠান্ডা কফি খাবার চেয়ে মনে থাকতে থাকতে গরম কফি কয়েক চুমুক খেয়ে নেওয়া ভালো।

বৃহস্পতিবার-শুক্রবার এই দুদিন তিনি সবচেয়ে ব্যস্ত থাকেন। স্বামীর অনলাইন ব্যবসার দিকটা একাই সামলান।

প্রফেসর শামসুদ্দীন আহমেদ শিক্ষকতার পাশাপাশি কাপড়ের ব্যবসা করেন। শিক্ষক

হবার আগে থেকেই তিনি ব্যবসার সাথে যুক্ত। 'লিবাস' নামে কাপড়ের দোকান। আগে ছিল শুধু অফলাইনে, এখন অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনে। ধানমন্ডিতে বড়ো শো-রুম। সেখানে বিশ্বস্ত ম্যানেজার রেখেছেন। ম্যানেজার সবকিছু দেখাশোনা করে। অনলাইনে লেনদেন হয়। প্রতিদিনের হিসেব তার স্ত্রী শামিমা বেগম দেখেন।

সপ্তাহের ছয়দিন অফলাইনে যত কাপড় বিক্রি হয়, তারচেয়ে বেশি বিক্রি হয় শুক্রবারে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা, হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পুরোটা সময় শুক্রবার। প্রতি শুক্রবারে প্রতিটি কাপড়ে থাকে বিশেষ ছাড়। কোনো কাপড়ে ৫০% ছাড় থাকে, কোনোটাতে তারচেয়েও বেশি। চব্বিশ ঘণ্টা ক্রেতাগণ অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। রোববার প্রায় সবাই কাপড় হাতে পেয়ে যান। হাতে পাবার পর টাকা দিতে হয়, ক্যাশ অন ডেলিভারি।

অ্যামেরিকাতে শুক্রবারে বিশেষ ছাড়ে জিনিসপত্র বিক্রিকে 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' বলে। শামসুদ্দীন লিবাসের অফারের নাম রেখেছেন 'গ্রেট ফ্রাইডে'। শামিমা বেগম লিবাসের ওয়েবসাইটে ঢুকলেন। কোন কাপড়ে কত পার্সেন্ট ছাড় দেবেন সেটা সকালে ঠিক করে রেখেছেন। এখন শুধু কাপড়ের সেল অপশনে ছাড়ের এমাউন্ট বসাবেন।

প্রথম প্রথম শামিমা বেগম বোরকার কেনা-বেচা দেখতেন। মেয়েদের কাপড়ের মান ও দাম নির্ধারণ করতেন। ডিপার্টমেন্টের ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় শামসুদ্দীন আহমেদ পুরোটা ছেড়ে দিয়েছেন স্ত্রীর ওপর। মজার ব্যাপার হলো, শো-রুম বা গোডাউনের কেউ জানে না যে, পুরো ব্যাপারটি 'ম্যাডাম' দেখেন। সবাই ভাবে সবকিছু 'স্যার' দেখেন। শামসুদ্দীন আহমেদও এই ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেন না। এটা এমন কোনো ভুল ধারণা না যা ভাঙাতে হবে। শামিমা বেগমও নীরবে কাজ করে উপভোগ করেন। ওয়েবসাইটের এডমিন তিনি, ইমেইলের রিপ্লাই তিনি দেন, সবগুলো অর্ডার গোডাউনে ফরোয়ার্ড করেন তিনি, লিবাসের একাউন্ট চেক করেন তিনি। সবকিছুই টাইপিংয়ের মাধ্যমে। কাউকে ফোন দিতে হয় না। একান্ত কারও সাথে কথা বলতে হলে স্বামীকে জানান।

শামসুদ্দীন আহমেদ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন। পাঞ্জাবি কিনতে যেতেন শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেট থেকে। কখনো-বা নিউ মার্কেট থেকে। একদিন বঙ্গবাজার গিয়ে কাপড়ের দাম দেখে তিনি অবাক। যে পাঞ্জাবি বঙ্গবাজারে ৩০০ টাকা বিক্রি হয়, সেটা তিনি কিনেন ৭০০ টাকায়। এত পার্থক্য?

ফার্স্ট ইয়ারে তার বন্ধুরা টিউশনি পড়াত। তিনি শুরু করেন কাপড়ের ব্যবসা। বঙ্গবাজার থেকে কাপড় কিনতেন। বৃহস্পতিবার-শুক্রবার হল গেটের সামনে টেবিলে করে কাপড় নিয়ে বসতেন। প্রথম প্রথম কেমন যেন লাগত! পরিচিত সবার সামনে বিক্রি করছেন। আস্তে আস্তে অস্বস্তি কেটে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, 'আমি তো চুরি করছি না। আমি তো ব্যবসা করছি। আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসা করেছেন। সাহাবীরা ব্যবসা করেছেন। বিখ্যাত আলেমগণ ব্যবসা করেছেন। আমি করলে অসুবিধা কী?'

সাহস করে সেদিন যে ব্যবসা শুরু করেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'লিবাস'। আরবিতে লিবাস মানে পোশাক। বন্ধুরা প্রতি মাসে টিউশনি পড়িয়ে, কষ্ট করে হল থেকে মানুষের বাসায় বাসায় গিয়ে যত টাকা বেতন পেত, তিনি হলের সামনে কাপড় বিক্রি করে তারচেয়ে দ্বিগুণ উপার্জন করতেন।

তখনকার তার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজ উদ্দিন শুনতে পান তার ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট বয় হলের সামনে কাপড় বিক্রি করছে। তিনি একদিন তাকে ডেকে নেন। শামসুদ্দীন আহমেদ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এমনিতেই ভয়ে ছিলেন, না জানি কে কী বলে। তার ওপর ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান তাকে ডেকেছেন। তার স্বপ্ন ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক হওয়া। এখন যদি ডিপার্টমেন্টে এসব জানাজানি হয়, অসুবিধা হবে না তো?

ভয়ে ভয়ে চেয়ারম্যান স্যারের রুমে ঢুকেন। 'স্যার, আসব?'

'হ্যাঁ, আসো। বসো।'

শামসুদ্দীন আহমেদের হাত-পা কাঁপছিল। স্যারের সামনে দাঁড়াতে পারেন না, বসবেন কীভাবে? চোখাচোখি হলো। স্যার ইশারা দিলেন—বসো।

'শামসুদ্দীন, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরীর নাম শুনেছ?'

'জি, স্যার। তিনি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিকের সমসাময়িক ছিলেন। কুফার ইমাম।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তাঁর এক ছাত্র ছিল। ছাত্রটিকে তিনি ব্যবসা করার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু সে ব্যবসা করতে আগ্রহী ছিল না। তার মনোভাব ছিল মানুষ তাকে দেবে, সে গ্রহণ করবে। এমন মনোভাব যাদের থাকে, তারা হক কথা বলতে পারে না। হক কথা বললে কথাটি যদি কারও বিরুদ্ধে যায়, আশঙ্কা আছে সে দানাপানি দেওয়া বন্ধ করে দেবে। তো, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী তার ছাত্রকে পরামর্শ দিলে সে শুনতে রাজি ছিল না। তখন তিনি ছাত্রকে ধমক দিয়ে বলেন :

"চুপ থাকো! আলেমগণের হাতে যদি দিনার-দিরহাম না থাকে, তাহলে ধনীরা তাদেরকে রুমালের মতো ব্যবহার করবে!"

আমি কথাটি কেন বলছি বুঝতে পারছ?'

শামসুদ্দীন আহমেদ মাথা নেড়ে বলেন, 'না, স্যার। এখনো বুঝতে পারছি না।' তিনি আসলে ধরতে পারছেন না স্যার কোনদিকে আগাচ্ছেন।

প্রফেসর মফিজ উদ্দিন বললেন, 'শুনলাম তুমি হলের সামনে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করছ। কাজটি তুমি নিজ উদ্যোগেই করছ বুঝতে পারছি। এসব বিষয়ে তোমাদেরকে উৎসাহিত করা আমাদের দায়িত্ব ছিল। আমরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ! আমার কাছে যখন খবর এলো, "আপনার ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট বয় হলের সামনে কাপড়ের ব্যবসা করছে, এটা শুনছেন?" আমি তখন মারহাবা বলে উঠলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যিনি আমাকে কথাটি বলতে আসেন, তিনি মূলত তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে কথাটি বলেন। তার আত্মসম্মানে লেগেছিল। আমি তাকে বোঝালাম, দেখুন মাওলানা, আমরা মদীনার সাত ফুকাহার একজন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী, ইমাম লাইস ইবনে সা'দ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহি আলাইহিম-গণের জীবনী পড়েছি। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ব্যবসায়ী। আবু হানিফা কাপড়ের ব্যবসা করতেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব আর লাইস ইবনে সা'দ তেলের ব্যবসা করতেন।

আমি যখন শুনতে পেলাম আমার ছাত্র সেইসব ইমামদের অনুসরণ করছে, গর্বে আমার বুকটা ভরে গেল। মাওলানা, দেখবেন আমার এই ছাত্র একদিন তাঁদের উত্তরসূরি হবে।'

শামসুদ্দীন আহমেদের চোখ টলটল করছিল। তিনি ভাবতে পারেননি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান তাকে ডেকে নিয়ে এভাবে উৎসাহ দেবেন। তার ব্যাপারে এমন ইতিবাচক আশা রাখবেন।

চেয়ারম্যান স্যারের রুম থেকে যখন বের হন, তখন ডানহাত দিয়ে চোখ মুছেন। বামহাতে ছিল একটি খাম। প্রফেসর মফিজ উদ্দিন ছাত্রের সাহসী উদ্যোগে আনন্দিত হয়ে ৫০০ টাকা দিয়ে বলেন, 'আমি জানি তোমার কাছে টাকা আছে। এটা রাখো। ব্যবসা করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয়, অর্থের টান পড়ে, সোজা আমার কাছে চলে আসবে।'

শামসুদ্দীন আহমেদের বিশ বছরের ব্যবসায় এখনো বড়ো ধরনের কোনো আর্থিক সংকটে পড়তে হয়নি। মফিজ উদ্দিন স্যারের ৫০০ টাকার ঋণ এখনো ভুলতে পারেন না। দুই বছর হলো স্যার ইন্তেকাল করেছেন। গত বছর খামে করে স্যারের ছেলের হাতে কিছু টাকা দিয়ে আসেন। খামের ভেতর কত টাকা ছিল সেটা দাতা-গ্রহীতা বাদে জানেন মাত্র একজন। সেই একজন মানুষের মনের খবরও জানেন; যা মানুষ কাউকে জানায়নি।

চার.

রাতে খাবার টেবিলে মামা-ভাগ্নের দেখা হলো। শামসুদ্দীন আহমেদের পরিবার এশার নামাজ শেষে রাতের খাবার খেয়ে নেয়। ভার্সিটির হলেও একই অবস্থা। রাতের খাবার দশটার মধ্যে শেষ করতে হয়। এরপর গেলে ভালো খাবার পাওয়া যায় না। বেশিরভাগ বাসায় যেখানে রাতের খাবার শুরু হয় রাত দশটার পর, শামসুদ্দীন সাহেবের বাসায় সেখানে দশটার আগে খাওয়া শেষ। খাওয়ার পর যার যা ইচ্ছে করুক। শামসুদ্দীন আহমেদ নিয়ম করে খাবার খান, সবাইকে নিয়মে অভ্যস্ত করতে চান। তার নীতি হলো—রাতে ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাবার খেতে হবে। ঘুমাতে ঘুমাতে বারোটা বাজে। সেই হিসেবে দশটার মধ্যে খাওয়া শেষ করতে হয়।

'তারপর, তোমার কী অবস্থা? ভার্সিটি লাইফ কেমন লাগে?'

মামার এই প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল আনাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পেছনে তার সবচেয়ে বড়ো অনুপ্রেরণা ছিল শামসু মামা। এস.এস.সি পরীক্ষা শেষে সে ঢাকায় এসেছিল। মামা তখন ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের এসিসট্যান্ট প্রফেসর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নামানোর আগে ভাগ্নেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভার্সিটির পাশে নীলক্ষেত।